সোনার পাথরবাটি

পদ্মাবতী গোস্বামী

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

সোনার পাথরবাটি □ ৯
স্রোতের মুখ □ ১৬
মন ভালো নেই □ ২১
দ্বিতীয় বাড়ি □ ২৪
ছবি পালটে যায় □ ৩৫
জ্বালাপোড়া □ ৪২
সকালের মেয়ে □ ৬২
তরুণী-নদীর ভিতরে □ ৭৮
মাঝরাতে ঘুম □ ৮৬
নতুন ফুলের সময় □ ৯৩
পিতৃতান্ত্রিক □ ১০১
সকাল বেলার গন্ধ □ ১১৭
তার ছায়ার সামনে □ ১২৪
চাঁদের ছায়ায় □ ১৩২
মুখ □ ১৩৯

সোনার পাথরবাটি

কালো মেয়ের বিয়ে হয়নি। বয়স তার চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই। বিয়ে হয়নি রঙের জন্য? নাকি দায়িত্বের বাঁধন ছিঁড়তে পারেনি বলে? নাকি মনের মানুষকে সময়মতো বরণ করতে পারেনি? তাই সে আবার বিজ্ঞাপন দেখে হবু বরের সঙ্গে দেখা করতে যায়। ফিরে আসে- না, শূন্য হাতে নয়। নিজের সম্পদের কথা নিজেই আবিষ্কার করেছে সে।

কাগজে বিজ্ঞাপনটা দেখে চোখ আটকে গেল। বাঙালি হিন্দু, বাহান্ন প্লাস, অধ্যাপক, সুদর্শন ডিভোর্সি জীবনসঙ্গিনী খুঁজছেন। জাতিধর্ম ভাষা বাধা নয়। দৈহিক ত্রুটিও গ্রহণযোগ্য। আমার এই চল্লিশ ছুঁই ছুঁই বয়সে বিয়ের ইচ্ছে একেবারেই নেই। আমাদের শ্যামবাজারের একান্নবর্তী বাড়িটার সমস্ত লোকজনও বিশ্বাস করে ললিতা আর বিয়ে করবে না। আর ওর বিয়ের বয়েস নেই। তবু বিজ্ঞাপনটা বার বার দেখতে থাকি।

আসলে আমার বিয়ের কোনো চেষ্টাই কেউ করেনি। স্কুলে একটু উঁচু ক্লাসে উঠেছি, মা মারা গেল। তখন কেয়া আর রাখী এতটুকু। আমার ছোট্ট দুটি বোন। কত দায়িত্ব। শুনতেই একান্নবর্তী। হাঁড়ি সব আলাদা। মায়ের মৃত্যুর পর বাবার যে কী হল, কাজকর্মই ছেড়ে দিলেন। আমি বি এ পাস করার পরের বছরই বাবাও....। এম. এ. পড়া আমার হল না। বি. টি. পাস করে নানা চেষ্টা চরিত্তির করে স্কুলে চাকরি পাই। বোন দুটি রূপসী ছিল। পাড়ার ভালো ছেলেদের সঙ্গে প্রেম-ভালোবাসা করে বিয়ে-থা করে ফেলল। কিন্তু ওদের তো লেখাপড়া বিয়ের খরচ পর্যন্ত আমাকেই করতে হয়েছে। প্রেম-ভালোবাসার বিয়ে হলে কী হবে খাট, আলমারি, বিছানাপত্র, লোক খাওয়ানো, মায়ের গায়ের গয়না, দিতে সবই হল। আমি ভালোবাসার সময়ই পাইনি। আমি রূপসী নই। কিন্তু একঢাল চুল ছিল। কালো মেয়ে বলেই বোধ হয় ভগবান আমার মুখখানি সুন্দর করেছিলেন। আমার চক্ষু দুটিউজ্জ্বল । গভীর। ঘন পল্লব। কিন্তু ওই যে রং কালো, কালো ময়লা, চাপা, কৃষ্ণবর্ণ, ফরসা নয়—শুনতে শুনতে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। যেন গায়ের রং নেই বলেই আমার বিয়ে হয়নি। মনে মনে হাসি পায় আমার। বিয়ে আমি ইচ্ছে করেই করিনি। সংসার চেপে বসেছিল আমার উপর। দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারিনি। নইলে চাকরি করা মেয়ের বিয়ের অসুবিধে হয় না। বিজ্ঞাপনেই দেখি চাকুরিরতা চাই। একলার রোজগারে আজকাল আর চলে না। নইলে প্রেমে তো আমিও....। সেই সতেরো বছর বয়সে। প্রীতিধন্য রায়ের সঙ্গে। সেও আমাকে দেখত। আমিও তাকে দেখতাম। বুক কাঁপত খুব। বুক কাঁপতে কাঁপতে একসময় বুকে ব্যথা হয়ে গেল। তার সংসারে একমাত্র মা। মা ছিল ভীষণ বদমেজাজি। ছেলে ভালোবেসে যে মেয়েকে পছন্দ করেছে সে পিতৃমাতৃহীন, ঘাড়ে দুটি বোন, বিশেষত সে মেয়ে কালো এবং বাতাসে যে

বাড়ির হাঁড়ি দুলছে। এরকম একটা সংসারে তার অমন রূপবান ধনী সদ্য ডাক্তারি পাস করা ছেলে বিয়ে করবে!

আত্মীয়স্বজনও চাইছিল না এ বিয়ে হোক। আমার বোনেদের দায়িত্ব যদি তাদের নিতে হয়! আমার বিয়ের কথা শুনে বোন দুটি ও কাঁদছিল। ছেলেমানুষ। দিদি বিয়ে করে কেটে পড়লে ওরা যে অনাথ হয়ে যাবে।

প্রীতিধন্য সংসারের সমস্ত দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়েই আমাকে চেয়েছিল। কিন্তু বড়ো অসম্মানিত মনে হয়েছিল নিজেকে। আমিও তো মানুষ। মেয়ে তো কী হয়েছে, মাথা উঁচু করেই আমার বোনদের মানুষ করব, লেখাপড়া শেখাব। আমার দায়িত্ব অন্যে নেবে কেন? প্রীতিধন্যর মায়ের চোখের 'দূর ছাই' কথাটা আমার সারা শরীরে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল।

প্রীতিধন্যকে আমি তবু বোঝাতে পারছিলাম না। সে মায়ের সঙ্গে বিরোধ করেই আমাকে গ্রহণ করতে চাইল। কিন্তু ওই যে 'দূর ছাই'। ওটা আমার অসহ্য। অল্প বয়সে রক্তে তেজ থাকে, নিটোল শরীরের রহস্যের আলোয় আলোকিত তখন আমি। আমার মাথাভর্তি চুল। পিছলে যাওয়া শরীর। দুটো তামার বাটি উপুড় করা আমার বুকে। আমি জানি আমার কী আছে! শরীর। লোভ। জেদ। সব মিলে আমি তখন দুর্বার। দু-বছর তিন বছর কেটে গেল। প্রীতিধন্য অন্য কোথাও বিয়েতে রাজি নয়। আর আমার তো বিয়ের প্রশ্নই নেই। দুটি বোন তখন আমাকে একেবারে আঁকড়ে ধরেছে। প্রীতিধন্য ফেলোশিপ করতে থাকে। বিদেশ যাত্রা। উনিশশো আশি সালের কলকাতায় তখন প্রেম-ভালোবাসা এই আটানব্বই সালের মতনই খোলামেলা ছিল। নারী-পুরুষের সম্পর্কটাও রাখো-ঢাকো ব্যাপার ছিল না। বিশেষ করে যে সব মেয়ে কেরিয়ার করবে ভাবত তারা শরীর নিয়ে মাথাই ঘামাত না। আমার সঙ্গেই বি. এ. পাস করেছিল নন্দিনী, সুপ্রিয়া, মানসী। ওরা বড়ো বড়ো প্রাইভেট ফার্মে চাকরি পেয়ে গেল।

নন্দিতা খুব ফরসা ছিল। তার কাছে 'সোনার পাথরবাটি' শব্দটা আমি প্রথম শুনতে পাই। সে নিজের দুটি স্তনের নাম দিয়েছিল 'সোনার পাথরবাটি'। খুব খোলামেলা স্বভাবের নন্দিতা আমাকে বলেছিল, 'সোনা রুপো ব্রোঞ্জ যা আছে কাজে লাগা নইলে ঈশ্বরই রাগ করবেন, বুঝলি? শুধু বাচ্চা খাবে বলে ভগবান এমন করে গড়তেন না, দুটি নিপল দিয়ে দিতেন, সেখান থেকে তরতর করে দুধ সাপ্লাই হত রে।

মূল্যবোধ? মূল্যবোধ আবার কী? আমরা কেউ প্রস্টিটিউট নই, আমাদের মনের মতন কিছু কাজ করতে হবে, সারা জীবনটা উপভোগ করতে হবে, সে জন্যেই না?'

মানসী বলেছিল, 'তুইই বল ললিতা, ফিলমস্টার রেখা কি মাধুরী কিংবা করিশমা ওরা শরীর এক্সপ্লয়েট করে না? তুই ওদের কী বলবি? ফিলমি ইতিহাসে গ্রেট কথাটা বলবি না? তুই ভেবে দেখ। মেয়েদের শরীরটা ফেলনা নয় রে।'

এই সময়টা পালটে গেছে সেটা আমিও জানি। আমার সেজোকাকার বউ খুব সুন্দরী ছিল। সে একটা বিজ্ঞাপন কোম্পানির মালিকের সঙ্গে এমন দহরম মহরম করল, মুম্বইতে তার নিজস্ব একটা ফ্ল্যাটই হয়ে গেল। কাকিমা এখন মুম্বইতে। ছমাস ওখানে। আর এখানে ছমাস। সেজন্য সেজোকাকাকে কখনও দুঃখিত হতে দেখিনি। পুরো কোম্পানিটাই

সেজোকাকিমার নামে লিখে দিয়েছে, কত দায়িত্ব সোনালির, আমি ওর কেরিয়ারে পেরেক ঠুকব কেন?

আমি প্রীতিধন্যর সঙ্গে বিদেশ যেতে পারি। তার সঙ্গে আমার প্রতিটি রাত শুভরাত্রির মতন হতে পারে। আমরা যেতে পারি ভোগের চূড়ান্তেও। প্রীতিধন্যের তো টাকার অভাব ছিল না। কিন্তু ওর মায়ের ওই 'দূর ছাই' শব্দটা আমাকে একেবারে শুইয়ে দিয়েছিল।

আমি প্রীতিধন্যকে একদিন পাঁচতারা হোটেলে থাকবার বায়না ধরলাম। প্রীতিধন্য তখন ব্যস্ত। বাইরে যাবে। সে অবাক হয়ে বলল, হোটেলে কেন? তার চেয়ে চল রেজিস্ট্রি অফিসে যাই।

দূর ছাই, আমি হোটেলেই যাব, তোমাকে সোনার পাথরবাটি দেখাতে চাই।

—সোনার পাথরবাটি? সে আবার কী?

—দেখতেই পাবে, কোন জিনিসকে তোমার মা 'দূর ছাই' করেছেন। আমি তোমার কাছে আর কিছু চাই না শুধু একটা রাত্রি....।

বোনদের বললাম মুকুটমণিপুর যাচ্ছি রমলার সঙ্গে। সেই একটা রাত। আমি প্রীতিধন্যকে উজাড় করে দিয়েছিলাম। নিয়েওছিলাম। মেয়েরা কি শুধু দেয়? পায় না কিছুই? আমি শাড়ি খুলেছিলাম। ব্লাউজ খুলেছিলাম। বক্ষবন্ধনী খুলে বলেছি, এই নাও সোনার পাথরবাটি, দ্যাখো, নাও নাও....কোন বস্তুকে তোমার মা 'দূর ছাই' করেছেন দ্যাখো তুমি।

আমার উন্মুক্ত বুকে সে মুখ রেখে বলেছিল, এরপর আর আমরা ফিরে যেতে পারি না ললিতা, কিছুতেই না, আমার মা তো তোমার মা, না হয় মাকে ক্ষমা করেই দিলে। আমি তোমাকে নষ্ট করে এভাবে কোথাও যাব না, বিদেশেও না।

—নষ্ট? একে তুমি নষ্ট হওয়া বল? আমাকে নষ্ট মেয়ে মনে হচ্ছে তোমার? মানুষ কি নষ্ট হয়?

তারপর আমি সত্যিই উধাও হয়ে গেলাম। অনেকদিন। বন্ধুদের বাড়ি। বুকে ব্যথা। সারা শরীরে অদৃশ্য ব্যথার রাজত্ব। প্রীতিধন্যকে বললাম, ফিরে এলে দেখা যাবে, এখন তো বিদেশে যাও। বিয়ের জন্যে পাগলামির কী হয়েছে?

প্রীতিধন্য ফিরে এল। প্রবল নামডাক। সেইসময় ওর মা মারা গেলেন। বিয়ের বাধা না থাকলে কী হয়, আমার মনে তো সর্বক্ষণই সেই 'দূর ছাই' শব্দটা। আমাকে তাঁর সংসারের পুত্রবধূটি করে নিয়ে যেতে চাননি। কেন যাব? তিনি নেই বলেই সুযোগটা নিতে হবে?

প্রীতিধন্য রাগ করে আবার বিদেশে চলে গেল। তারপর সম্পর্কটা একসময় ভাঙল। দেখা নেই। শোনা নেই। চিঠিপত্র নেই। সম্পূর্ণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। সময় গড়িয়ে যেতে যেতে সম্পর্কও তো পাশ ফিরে শোয়।

কিন্তু আমার বুকের মাঝখানে ব্যথাটা রয়ে গেল। আমি না পারলাম আর কারও দিকে চাইতে, না কাউকে ভালো লাগাতে। আমার চক্ষু দুটিতে প্রেম ছিল না।

শরীরের সমস্ত ছন্দ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল আমার। শুধু বুকের মাঝখানটায় ব্যথা। আমি সবসময় স্পষ্ট দেখতে পাই প্রীতিধন্যর মুখ আমার বুকের মাঝখানে। আমার চক্ষু অসাড়। প্রীতিধন্য ছাড়া আর কারুকে দেখতে পাই না আমি।

এই চল্লিশ ছুঁই ছুঁই বয়সেও। কত কালকার সেই ব্যথা? এ বাড়িও পালটে গেছে। বোনেরা খুব ব্যস্ত। একজন দেরাদুন। অন্যজন এলাহাবাদ। সেজোকাকিমা মুম্বই। ওর দুই মেয়েই এখন সাবানের বিজ্ঞাপনে। বড়োপিসির মেয়েরা হোটেল ম্যানেজমেন্ট পাস করে একেবারে গ্র্যান্ডে কাজ পেয়ে গেছে। ছেলে দুটো মস্ত ডিজাইনার। এ বাড়িতে এখন আমিই স্কুল-দিদিমণি। কালো বলে বিয়ে হয়নি। কথাটা বড়ো বুকে বাজে। কিন্তু এখন আর আমিও দরিদ্র নই। আমার নিজস্ব একটা টিভি আছে। টেলিফোন আছে। আমার দুখানা ঘরেই দামি পরদা ঝোলে। স্কুলে নিয়মমতন মাইনে পাই। দেশের অবস্থা দারিদ্র্যসীমার নীচে হোক, থার্ড ওয়ার্ল্ড কানট্রির লোক বলা হোক, কিন্তু টিউশনিতে প্রচুর টাকা। অঙ্ক বিজ্ঞ পড়িয়ে হাজার টাকা একটা ছাত্রীই দেয়। আমি আত্মীয়স্বজনকে দিই। বড়োপিসিকে নতুন কাপড় কিনে দিই। বোনেদের পাঠাই। তবু বদনাম আমার ঘোচে না। আহা কালো বলেই তো ওর বিয়েটা....। অথচ কত সুপুরুষের যে কালো বউ দেখলাম। শুধু কালো নয় তারা। দেখতেও কিছুই না।

এদের মুখে ঝামা ঘসবার জন্যেই বিয়ে করতে ইচ্ছে করে। তবে ঠকাব না কাউকে। এ ভদ্রলোক ডিভোর্সি। একরকম আমিও তাই। প্রীতিধন্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন তো অনেক কাল। সবই হয়েছিল। শরীর। ভালোবাসা। আর আমার বুকে ব্যথা।

ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে তা হোক। বাহান্ন বছরের পুরুষ তো আর বাহান্ন চাইবে না। সে নিজে যাই হোক, ছুকরিই চাইবে। আমি ছুকরি নই। কিন্তু টোল খায়নি। নিটোল। শুধু একটা রাত্রের দংশন।

ভদ্রলোক অধ্যাপক। আমি বিদ্বান না হলে কথা বলে সুখ পাই না। কিন্তু দৈহিক অসুবিধেও গ্রহণযোগ্য লিখেছেন কেন? প্রতিবন্ধী মানুষকে বিয়ে করতে রাজি নাকি? আমার খুব কৌতূহল হয়। ব্যাপারটা কী জানতে হয়। পোস্ট বক্সের ঠিকানায় চিঠি দিলাম। কোথায় বিয়ে কোথায় কী তবু বুকটা টিপ টিপ করে উঠল।

চিঠির উত্তর এল। বায়োডাটা নিয়ে। এ কে সরখেল। আমেরিকার সিটিজেন। এককালে দেশ ছিল মেদিনীপুর। তিনি ভিজিটিং প্রফেসর। বিষয় দর্শন। বিশ্ববিখ্যাত। কাগজপত্রে আমিও যে ওঁর ছবি দেখেছি। পড়েছি সাক্ষাৎকারও। অল্প মনে পড়ছে।

আমার সঙ্গে দেখা করতে আগ্রহী। অবশ্য বায়োডাটায় আমার যদি আগ্রহ হয়। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ার্টার্সে থাকেন। তবে তিনি আমাকে সরাসরি ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিতেই দেখা করতে যেতে বলেছেন। গেলাম। টেলিফোনে অ্যাপায়েন্টমেন্ট করেই।

তখন বিকেল পাঁচটা। ফাল্গুনমাস। কলকাতাতেও বসন্ত বেশ স্পষ্ট। বিশেষ করে ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে কৃষ্ণচূড়ায়। রাধাচূড়ায়। চারদিক কেমন আউল বাউল। উদাস। কোকিল ডাকছে। কতদিন পরে যেন কোকিলের ডাক শুনলাম। কোকিল ঠিকই ডাকে। আমিই শুনতে পাই না। হুস করে মনে পড়ল আজ তেরোই মার্চ। প্রীতিধন্যের জন্মদিন। আমার বুকটা ব্যথায় ডুবে গেল।

ইস আর কী! এই ব্যথা নিয়েই মরব নাকি? সে তো একেবারে আরামে আয়াসে বউ মেয়ে নিয়ে সাহেবদের দেশে জীবন কাটাচ্ছে। আর আমার জীবন! ধ্যুস। ও সব ভাবালুতার

কোনো মানে হয় না। আমার বন্ধু শ্রীলেখার স্বামী মারা গেল এই সে দিন। সাঁইত্রিশ বছর বয়সেও দিব্যি সে বিয়ে করল। আহা। সারা জীবনটাই তো ওর পড়ে আছে। সবাই বলল। অথচ শ্রীলেখার একটা দশ বছরের মেয়ে আছে। দিব্যি সুন্দর। আমার যদি অমন একটা মেয়ে থাকত! আমি কোনোদিকে চাইতাম না। বয়ে গেছিল একটা ডিভোর্সি প্রৌঢ় মানুষের সঙ্গে দেখা করতে।

আচ্ছা মিস্টার সরখেলের সঙ্গে আমি একটু দেখা করতে চাই। হ্যাঁ, স্যার তো বলেই রেখেছেন। আপনি মিস ললিতা....

তিনি ছাত্র পরিবৃত। হাসিমুখে ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলছেন। আমাকে দেখেই আসুন আসুন। আন্তরিক ভঙ্গি। সর্বদাই হাস্যমুখ।

কফি এল।

উনি একটু মাথা নিচু করার ভঙ্গিতে বললেন, দু-মিনিট সময় চেয়ে নিচ্ছি, আপনার কাছে।

আমি বললাম, না না, আমার তাড়া নেই।

আমি অপলক। এই মানুষটা কি আমার বাকি জীবনের সঙ্গী হবে? দেখতে এক সময় সুপুরুষ ছিলেন। দীর্ঘদিন বিদেশে আছেন বলে বাংলাটা অন্য রকম। লম্বাটে মুখ। লাল চুল। পাতলা। ছোটো নাক। সাধারণ চোখ। তামা রঙের চশমা। শার্ট প্যান্ট। গলায় টাই। চেয়ারের পাশে একটা মজবুত চেহারার লাঠি। লাঠি কেন?

লক্ষ করে দেখি ভদ্রলোক যেন বড়ো দুর্বল। চোখের নীচে কালি। কৃশ। শুকনো মুখ।

আমি কীভাবে কথা শুরু করব বুঝতে পারছি না। আমার সাজগোজটাও বড্ড বেশি সাধারণ হয়ে গেছে বলে মনে আর জোর নেই। চুলটা পার্লারে গিয়ে ঠিক করতে পারতাম তো। অস্বস্তি ঢাকতে মাথা নিচু করি। ইস্ শাড়িটাও এত ফ্যাকাসে।

—হ্যালো ম্যাডাম, তারপর বলুন।

—হ্যাঁ, মানে আপনি কলকাতাতেই থাকবেন এখন?

—জানি না। কালকেই হয়তো নিউইয়র্ক চলে যেতে পারি। আমার সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়েছিল। ব্রেন যায়নি। কিন্তু ডান প্যাটা...লেফট সাইড...। অনেক ভালো এখন। হাঁটতে পারি। কষ্ট হয়।

উনি হাসতে থাকেন। আমি বুঝতে পারি সেই জন্যেই উনি বিজ্ঞাপনে লিখেছেন দৈহিক অসুবিধে কোনো সমস্যা নয়।

ওর বিয়ের ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু এখানে কিছু বন্ধু-বান্ধব আছে। তারা বিয়ের জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে। নইলে বেশ আছি। অনেক ছাত্র আমার। সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে।

উনি ইংরিজিতেই কথা বলছেন। ভারী সাবলীল ইংরিজি। আমার ভালো লাগছে খুব। ওঁর শারীরিক এত বিপর্যয় গেছে। আমার মায়া হল। প্রতিভাবান মানুষ। খানিকটা এলোমেলো।